ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 283- 288
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.208

ছোটগল্পকার জগদীশ গুপ্তের ‘চন্দ্র-সূর্য যতোদিন’ গল্পে নারীর করুণ জীবনালেখ্য: একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

প্রিয়তমা মজুমদার, *স্বাধীন গবেষক, লংকা (হোজাই), আসাম, ভারত*

Received: 20.09.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Every person living in society survives through his own view point, meditation, thinking and deep self-esteem. These meditative ideas and feelings are shaking from the human being. This debut is made as a poet in the literary world, some as a novelist or story teller. There come the authors, environmental situation, justice, love, events and various simple and complex stories.

Jagadish Gupta (1886-1957) made his poet in the next Bengali fiction, but later he got a permanent seat as a prominent short storyteller. He expressed a unique creation of his deep life in his literary work. In the middle of the twentieth century, Jagadish Gupta was very exceptional than other storytellers. Because in his story there is no mention of natural beauty or any romantic event or character. He is a very destiny writer. In his composition comes the sharp images of the dark complexity of the human mind. The human characters in his story are seen in selfishness, sexuality, greed, hatred and scientific mindset. He has shown to the reader society of Bengal that the greed, sexuality, selfishness of human being takes people and how tragic it can be. Author Jagadish Gupta has shown a finger in the eyes of the society through his literary work, the tragic scene of the pain of the woman’s mind. He is a man even though he seems to have seen and felt very closely. This is a remarkable description in his short story. The craft of his kind of tragic scenario gives the reader to the heart. These topics by author Jagadish Gupta led the Bengali short story to a new direction.

Keywords: Jagadish Gupta, woman, society, problems, mental agony, dark complexity of the mind.

(এক)

সমাজ সংস্কারের বাহনই হল সাহিত্য। সাহিত্য আমাদের আলোর দিশা দেখিয়ে দেয়। এই আলো চিরন্তন। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী এবং বর্তমান আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য উজ্জ্বল শিখরে দাঁড়িয়ে আছে সাহিত্যিকদের রচনার শিল্প ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে। যেখানে বাংলা সাহিত্যিকরা তাদের উপন্যাস নাটক ও গল্পের মধ্য দিয়ে সমাজের বৈচিত্র্যতাকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। এই বিচিত্রতার মধ্যে উঠে আসে সামাজিক পরিবেশ, পরিস্থিতি, সমস্যা, দ্বন্দ্ব, প্রেম, স্নেহ, আকর্ষণ, ন্যায়-অন্যায়, শাসক ও শোষক শ্রেণী, দারিদ্রতা, নারীর মানসিক কষ্ট ও নানা চরিত্রের টানা পোড়েন। বাংলার পাঠক সমাজ এই সমস্ত কিছুর বিষয় বিশ্লেষণের সঙ্গে গভীর ভাবে পরিচিত।

বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোট গল্পকার রবীন্দ্রনাথের গল্পে দেখা গেছে গ্রাম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং রহস্যলোকের অতিপ্রাকৃতভাবের (নিশীথে) প্রতিচ্ছবি। কিন্তু রবীন্দ্র পরবর্তী লেখক বা গল্পকার হয়ে উঠেছে অনেকটা স্বতন্ত্র। তাঁদের গল্পগুলো নিজস্ব মহিমায় মহিমান্বিত। যেখানে কেবল মানুষের বহির বর্ণনা নয়, বর্ণিত হইয়েছে চরিত্রের অন্তরের মর্মান্তিক যন্ত্রণার বিশ্লেষণ। এমনই একজন লেখক বাংলা ছোট গল্পে নতুন সৃষ্টির আলোকে ওঠে এসেছেন জগদীশ গুপ্ত। তাঁর গল্পে প্রেম ভালবাসার কোন রোমান্টিক বর্ণনা নেই। আছে সমাজের মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষের ভিতরের প্রতিচ্ছবি। তাঁর গল্পে উঠে আসে নারী চরিত্রের মনস্তাত্বিকতা,অবমাননা ও অবহেলিত রূপের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তাঁর 'চন্দ্র সূর্য যতোদিন' গল্পটি। এই গল্পের সামাজিকতা নারী মনের অন্ধকার জটিলতা, চরিত্রের মানসিক কষ্টের আলোচনাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু।

(দুই)

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা সাহিত্যে জগদীশ গুপ্তের আগমন ঘটে পুরাতন ভাব-ভাবনা ও রীতিনীতিকে পরিত্যাজ্য করে এক নতুন বিষয়-ভাবনার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের গল্প কিংবা তাঁর সমকালীন কোনো গল্পকারের রচনার প্রভাব তাঁর গল্পে পাওয়া দুর্লভ। তিনি নতুন চিত্র চেতনার মধ্য দিয়ে তাঁর গল্পগুলোকে পাঠক মহলে পরিবেশন করেছেন। তাঁর গল্পে মানব জীবনের হিংস্র নির্মম (পয়োমূখম্) ও যৌন অপরাধের (কলঙ্কিত সম্পর্ক) ছবি এঁকেছেন। কখন তিনি হয়ে উঠেছেন নিয়তিবাদী লেখক। তাঁর গল্পের ঘটনা নিয়তির ওপর নির্ভরশীল। (দিবসের শেষে)। সাহিত্য সমালোচনায় জগদীশ গুপ্তকে নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করেছেন। জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষের তুলনামূলক আলোচনা করে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,

> "এই তিন গল্প লেখকই প্রত্যক্ষের আড়ালে জীবনের যে জটিলতা, রহস্যময়তা, স্ববিরোধিতাকে জানতে চেয়েছিলেন। গল্পকার হিসেবে তাঁরা চরিত্রের প্রতিপক্ষপাতশূন্য, আবেগ বিষয়ে নিরবিকার, শিল্পীহিসেবে নিরাসক্ত (ডিট্যাচড) পরিবেশ সচেতন, বিজ্ঞানবুদ্ধি- সচেতন। ..... তিনজনই কুচক্রী অন্ধ নিয়তির লীলা ও 'শয়তানি শক্তি' সম্পর্কে অবহিত, মানবজীবনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন, নিরমহ, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণে আগ্রহী। আবার অমিলও আছে। জগদীশ গুপ্ত তিক্ত, নৈরাশ্যবাদী জীবনকে আগা গোড়া নির্মম দৃষ্টিতে দেখেছেন।"[১]

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস হোক, কাব্য-কবিতা, গল্প কিংবা নাটকই হোক সমস্ত কিছুতেই একটা দীর্ঘ প্রেক্ষাপট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নারী। নারীকে দিয়েই শুরু নারীকে দিয়েই শেষ (বিষবৃক্ষ)। তবে যুগের বা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকদের হাতে গড়ে ওঠা নারীরাও পরিবর্তন হতে শুরু করল। তাদের মন মানসিকতায় সাহিত্যিকরা নতুন রূপ দিতে শুরু করল। তাই বাংলা সাহিত্যে নারীর মনস্তাত্বিক দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়। বাংলা সাহিত্যের আনাচে-কানাচে নারীর মানসিক দ্বন্দ্ব, দুঃখ প্রতিফলিত হয়ে এসেছে। তারা দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পায় না। দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায়ও নেই। নারী মনের অন্তর দ্বন্দ্বের আঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আছে জগদীশ গুপ্তের 'চন্দ্র সূর্য যতোদিন' গল্পটি।

(তিন)

'চন্দ্র সূর্য যতোদিন' অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য যতদিন আছে সংসারে স্ত্রীলোকের হাসি-কান্না, দুঃখ-যন্ত্রণাও ঠিক ততোদিন থাকবে। তাদের দুঃখের দিকে নজর দেওয়া পরিবারের বিশেষ করে স্বামীর তেমন প্রয়োজনবোধ হয় না। সেই দিকে দেখার কোনো অবসর নেই। এই গল্পের প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্র হল ক্ষণপ্রভা। লেখক জগদীশ গুপ্ত দেখিয়েছেন, ক্ষণপ্রভা তার সংসারে ক্ষণকালের জন্যই সুখী হয়েছিল। ক্ষণকালের জন্যই স্বামীকে জীবনের সর্বস্ব সত্য বলে জেনেছিল। কেননা বিবাহের পর স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র সম্বল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পরক্ষণেই তার জীবনের আলোয় অন্ধকার নেমে আসে স্বামীর সম্পত্তির প্রলোভনে দ্বিতীয় বিবাহের মধ্য দিয়ে। স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ নারীর জীবনে বজ্রাঘাতের মতো পড়ে। কিন্তু তারা নিরুপায়, কোনো ভাবে তারা জীবনের সূতো ছিড়ে যাওয়াকে আটকাতে পারে না। এই গল্পেও ঠিক তাই হয়েছে। কেননা সংসারে স্ত্রীলোক বড় অবহেলিত, তারা অসহায়। এই প্রসঙ্গে নারীবাদী লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন—

> "যখন আমার খুব কম বয়স তখন থেকে দেখতাম পারিবারিক জীবনে...আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের কথাই বলছি ... ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মূল্যবোধের বড় বেশি তফাৎ। মেয়েরা যেন

> কিছুই নয়, আর ছেলেরাই পরম মানিক, এই রকম ব্যাপার। ...সব জায়গাতেই দেখতাম পুরুষদের প্রবল প্রতাপ। ... অল্পবয়সী মেয়েদের বিশেষ করে বৌদের জীবন ছিল দুঃখের নিরুপায়ের, যেগুলো মনকে দারুণ অস্থির করত।"[২]

জগদীশ গুপ্তের এই গল্পের ক্ষণপ্রভা চরিত্রটিও তার ব্যাতিক্রম নয়। ক্ষণপ্রভাও নিরুপায়। সে নিজে গিয়ে স্বামীকে মুখ ফুটে বলতে পারছে না যে তার দ্বিতীয় বিবাহ ক্ষণপ্রভার ভিতরের সমস্তকিছুকে উজার করে দিচ্ছে। স্বামীর ভালবাসা স্ত্রীর সম্পদ, এর অংশীদার কেউ হয়ে উঠবে তা কোনো স্ত্রীই মেনে নিতে পারে না। বিষবৃক্ষের সূর্যমুখীও মেনে নিতে পারে নি। একই গৃহে স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীর উপস্থিতি সহ্য করা যায় না। সূর্যমুখী পারে নি। সে গৃহ ত্যাগ করেছে। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের গল্পে একটা চমক অপেক্ষা করছে। যেটা পাঠকের কাছে অপ্রত্যাশিত। এটা তার গল্পের বিশেষত্ব। ক্ষণপ্রভার ভিতরের অন্ধকার জটিলতাই তাকে তিল তিল করে প্রতিদিন ক্ষত-বিক্ষত করছে, যখন তারই ছোটবোন প্রফুল্ল সতীন হয়ে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজেরই ছোটবোন একদিন সতীনের সম্পর্কে দাঁড়াবে এটা তার কল্পনার অতীত ছিল। সংসার দু-টুকরো হয়ে যাবে এটাও কল্পনার অতীত ছিল।

আর পাঁচটা মেয়ের মতো ক্ষণপ্রভার চিন্তা-ধারণা এরকম ছিল যে সে ভাবছে স্ত্রীলোকের সংসারে মেরুদণ্ড বুঝি তাদের বয়সে কিংবা যৌবনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এই যৌবনের দিকেই বুঝি পুরুষের লোভ। সে দেখছে তার বয়স ১৯ পার হয়েগেছে। তার পাশাপাশি একটি সন্তানের জননীও হয়েগেছে। অর্থাৎ সে এখন বুড়ি। লোকসমাজের এই ভ্রান্ত ধারণা কুড়ি মানে বুড়ি তাকে ক্ষত-বিক্ষত করছে মনে মনে। জগদীশ গুপ্তের বর্ণনায়—

> "ক্ষণপ্রভা মনে-মনে স্বামীর দিকে চায়— আবার মনে-মনে নিজের দিকে চায়— মনে-মনে যাচাই করে তার বয়স আছে কি গেছে...একবার মনে হয়, গেছে; একবার মনে হয়, যেন আছে— তার বুকের ভিতর সন্দেহ জাগিয়া একটা পিণ্ডের মতো দুলিতে থাকে... কান্না-হাসির দীপক মল্লার চলিতে থাকে।"[৩]

ক্ষণপ্রভা চেয়ে দেখছে প্রফুল্লের যৌবনের যেন ইয়ত্তা নেই। ১৫ বছর বয়সী যুবতীর রূপ যৌবনের প্রথম পর্যায়ে জ্বল জ্বল করছে। ক্ষণপ্রভা লক্ষ্য করেছে দুই বউয়ের তুলনায় পাড়া প্রতিবেশীর কাছে প্রফুল্লই জয়ী হয়েছে। ক্ষণপ্রভা সহ্য করতে পারল না মনে মনে ব্যথিত হয়ে ভাবছে এমনও একটা দিন সে পার করে এসেছে যখন তার স্বামী তার দিকে মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে থাকত। তার কল্পনা লেখকের ভাষায়—

> "মুগ্ধ নেত্রে স্বামী এই দেহখানার দিকেও তো একদিন চাহিয়া থাকিতেন— পুলকে তখন শির শির করিয়া সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগিত।... সেদিন গত কি বিদ্যমান সে সংবাদটা তার মর্মস্থলে কোনোদিন পৌঁছিতো কিনা কে জানে; পৌঁছলেও সে কি আকার লইয়া আসিত তাহা অনুমান করাও সুকঠিন; কিন্তু বড় কষ্টের কথা এই যে, না-থাকার সে নিদারুণ সংবাদটা আজ যে মহাসমারোহ সহকারে তার সুপ্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া এমন অকস্মাৎ তার অন্তঃ স্থলে আনিয়া দিলো সে তাহারই বোন!"[৪]

(চার)

ক্ষণপ্রভা মনে মনে তার স্বামী দীনতারণের শয্যাংশের কথা ভাবে সেখানে স্বপ্ন, জাগরণ, হর্ষ, তৃপ্তি স্মৃতিগুলো ছিল খুবই মধুর। কিন্তু আজ সেই মাধুর্যে ঘৃণা প্রবেশ করেছে। স্বামীর শয্যাংশটি স্ত্রীর চিরন্তন স্থানের দখলকারী কেউ হতে পারে না এতদিন ক্ষণপ্রভা এটাই জেনে এসেছে। বিশ্বাস করেছে। সেই ভালবাসার ফল স্বরূপ শিশু সন্তানের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু ভালোবাসা, বিশ্বাস কি এখানেই সমাপ্ত যে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে হল শুধুমাত্র সম্পত্তির লোভে। মনে মনে আত্মঘাতকের মতো মরতে থাকে। ক্ষণপ্রভা তার স্বামীর শয্যাংশটি নিজের ইচ্ছেই ছেড়ে দেয়নি। লৌকিকতায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। বরঞ্চ বলা যায় সামাজিক নিয়মই ছাড়তে বাধ্য করেছে। সেই স্থানের মাধুর্যতা মনে করে ক্ষণপ্রভা লজ্জিত হয় এটি গ্রহণ করেছে তারই ছোট বোন!

কিন্তু ক্ষণপ্রভার এই গভীর মনস্তাত্বিক দ্বন্দ্ব, কষ্ট প্রফুল্ল কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। যদিও শাশুড়ি সুভদ্রার চোখে কিছুটা ধরা পড়ে কিন্তু সেখানে কোনো প্রতিকার হয় না। প্রতিকার করার মতো সময় তখন অতিক্রম হয়ে গেছে। এখানে দীনতারণ তার স্বাধীন মতো চলছে সমাজের আর পাঁচটি পুরুষদের মতো। দ্বিতীয় বিবাহে প্রথম স্ত্রীর দুঃখ, মর্মান্তিক ভাবনার দিকে গুরুত্ব দেওয়ার মতো কোনো আগ্রহ তার চরিত্রে প্রকাশ পায় না। তার কাছে দ্বিতীয় বিবাহ

তেমন কোন গুরুতর অপরাধের মধ্যে পড়ে না। অন্য দিকে ক্ষণপ্রভা তার মাতৃত্ববোধটাকে শেষ অবলম্বন হিসেবে বাঁচিয়ে রেখে স্বামী দীনতারণের পিতৃসত্ত্বা কতটা জেগে আছে তার পরীক্ষা করার জন্য ছেলে অংকুরকে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দিত তার কাছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দীনতারণ ছেলেকে ফেরত পাঠিয়ে দিত। ছেলেকে একবার কোলে নেওয়ার সময় তার নেই। অথচ সামান্য জ্বরে ভুগী প্রফুল্লকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখতে আসে অজস্র কাজের ব্যাস্ততার মাঝেও। এখানে দীণতারণের পিতৃসত্তার হনন হয় এবং রূপ, যৌনতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ দেখা যায়।

একটু একটু করে ক্ষণপ্রভার মনের অন্ধকার বেড়ে চলে। যখন প্রফুল্ল সলজ্জায় তার দিদিকে এসে বলে 'তুমি আজ ওপরে শুয়ো। ওর ছেলে চায়।' ঠিক এই ভয়টাই পেয়েছিল ক্ষণপ্রভা। এই ভয় তাকে তিল তিল করে মারছে। কোনদিন তার পায়ের নীচের শেষ জমিটুকু চলে যাবে। স্বামীর যেই স্থানে একদিন ক্ষণপ্রভা ছিল সেখানে আজ অন্য কেউ এত সহজে প্রবেশ করে নিল! ক্ষণপ্রভার কাছে পুরো পৃথিবীটাই সেই মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করে তার কাছে সন্তান কামনা করছে। ক্ষণপ্রভার বেদনা দায়ক অনুভূতি—

> "যেন প্রফুল্ল বুকে দাঁত বসাইয়া তাহার দেহের রক্ত শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত এক নিমেষেই চুষিয়া শুষিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেছে এমনি বিবর্ণ পাংশু মুখে ক্ষণপ্রভা সম্মুখের দিকে চাহিয়া কেবল শূন্যকেই দেখিতে লাগিল।"[৫]

তাহলে কি এতদিন সে এক মিথ্যে জগতের আশ্রয়ে ছিল। স্বামীর অন্তর্জগতে তার জন্য যে ভালবাসা ছিল, যে অনুভূতি, আকর্ষণ এই সমস্ত কিছুই কি ভুল, সব মিথ্যে। সে গুলো কি কোনো কালেও সত্য ছিল না! —

> "ক্ষণপ্রভার মনে হইতে লাগিলো, তাহার জীবন মিথ্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রীতি সব মিথ্যা— সর্বোপরি, সন্তান-ধারণও মিথ্যা—"[৬]

পরম্পরাগতভাবে এই গল্পেও ক্ষণপ্রভা পুরুষের পদতলে পিষে গিয়েছে। বেঁচে থাকার কোনো শিকড় পাচ্ছে না, যেটাকে আঁকড়ে ধরবে। ক্ষণপ্রভার চরিত্রের মনস্তাত্তিক কষ্ট, দুঃখের বর্ণনায় জগদীশ গুপ্ত প্রশংসনীয়। নারী চরিত্রের এই টানাপোড়েন এই গল্পের মাধুর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই অনুভূতি জগদীশ গুপ্ত পাঠক চিত্তেও জাগিয়ে তুলেছেন। ক্ষণপ্রভার মনের ভয়, দুর্বলতা, দ্বন্দ্ব, মানসিক কষ্ট গুলো ঠিক এইভাবে প্রকাশ পায়—

> "ক্ষণপ্রভার মনে হইলো তার চতুর্দিকে অন্ধকার ঘিরিয়া আসি আছে ... স্নিগ্ধ সুবিস্তৃত অন্ধকার নহে ... সে অন্ধকার সঙ্কীর্ণ, কাঁটার মতো চোখে বেঁধে। ... সেই অন্ধকারে কেন্দ্রে সে ... চারিদিকে যাহার বিচরণ করিতেছে তাহারা যেন এ পৃথিবীর মানুষ নয় ...তারা এমনই বিকৃত, বীভৎস।"[৭]

(পাঁচ)

এই গল্পে ক্ষণপ্রভা চরিত্রের আর একটি দিক লক্ষ্য করা যায়, তার চরিত্রে কোনো ঈর্ষা বা হিংসা ভাব নেই। নেই কোনো উগ্রতার ছায়া। মুখ ফুটে কোন প্রতিবাদও সে করে নি। সে কেবল ভিতরে ভিতরে কষ্ট পেয়ে গেছে। ছোট বোন তার সতীনের স্থান দখল করলেও সরল বোনের প্রতি তার ভালোবাসা ও মমতাই দেখা যায়। পরম্পরাগত ভাবে সতীনভাবনায় তার মন বিষাক্ত হয়ে যায় নি। ক্ষণপ্রভার মনের গভীরতা, তার দুঃখ, কান্না সরল প্রফুল্ল কোনোভাবেই বুঝতে পারে না। এই সম্পর্কের গভীরতা ১৫ বছরের প্রফুল্ল অনুভব করতে পারে না। প্রফুল্ল স্বামি দীনতারণের মনোরঞ্জনের জন্য সাজে, টিপ পড়ে, চুল বাঁধে। প্রফুল্লর এই অভিলাস টুকু দেখে ক্ষণপ্রভা মনে মনে ভাবছে— এই অভিলাস একদিন মিথ্যে হয়ে যাবে। প্রফুল্লও একটা মিথ্যেকে জীবনের বড় সত্য ভেবে তারই মতো ভুল করছে। একটা মিথ্যে স্বপ্নপুরি তৈরী করছে। একদিন ক্ষণপ্রভাও এই স্বপ্নপুরী তৈরী করেছিল। কিন্তু আজ তা নিমেষেই শেষ হয়ে গেল। ক্ষণপ্রভার গভীর আত্মউপলব্ধিরই ছবি বারংবার আমাদের সম্মুখে উঠে আসে এইভাবে—

> "প্রফুল্লর প্রসাধনের দিকে নিঃস্পৃহ চক্ষে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে ক্ষণপ্রভার মনে হইল, ইহার অদৃষ্টও তো তাহারই মতো; উর্ণনাভের তন্তুকেই এ-ও প্রেমের বন্ধন বলিয়া ভুল করিতেছে; ভুগের কেবলি বর্ধিষ্ণু ক্ষুধার মুখে আহার তুলিয়া দিয়া এ-ও... চরিতার্থতার কিছু বাকি রহিল না। কিন্তু যেদিন আত্মার ক্ষুধার দাবি মিটাইবার দিন আসিবে— কোনো কথা কানে ভুলিতে চাহিবে না—

> তখনই মায়াবীর এই স্বপ্নপুরীর চিহ্নও রহিবে না ... দেখিতে হইবে, সব শূন্য; ... বৃথাই সে অগ্নিতে ঘৃত ঢালিতেছে ...।"[৮]

ক্ষণপ্রভা ছোট বোন প্রফুল্লের প্রতি মমতায় ভরে উঠে, তাকে স্পর্শ করে চুম্বন করে, ভাবে এই কোন পথে এই দুই নারী ভাসতে চলছে। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এই সম্পর্কের অবনতি। ক্ষণপ্রভার এই মানসিক দ্বন্দ্বের বর্ণনা গোটা নারী সমাজের কঠিন সত্যকে উজ্জ্বল ভাবে সকলের সম্মুখে তুলে ধরেছেন—

> "হঠাৎ সে হাত বাড়াইয়া প্রফুল্লের চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করে; ভাবে, 'কোথায় চলছি আমরা। এ কেন আমার সঙ্গিনী হ'লো!' ... ভাবিতে-ভাবিতে মন তার চিন্তার জটিল গহনের অপার অন্ধকারে হারাইয়া যায়; একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিবার মতো সামর্থ্য সজীবতা তার প্রাণের থাকে না।"[৯]

(ছয়)

গল্পের পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় ক্ষণপ্রভার মানসিক যন্ত্রণা সীমা পার করে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। দীর্ঘ ব্যবধানের পর যখন স্বামী দীনতারণ তার দিকে দৃষ্টিপাত করে, পুরোনো শয্যায় আসে, শিশুকে দেখে আর বলে— "খুব রোগা হয়ে গেছো দেখছি। খোকাকেও তো রোগা-রোগা দেখছি।"[১০] লেখক জগদীশ গুপ্ত এর চমৎকার বর্ণনা দিয়ে বলছেন,

> "বহুদিনের পর স্ত্রী, পুত্রের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় দীনতারণের এই উৎকণ্ঠা পৃথিবীর সূচ্যগ্র ভূমিও স্পর্শ করিল না— হাওয়ায় ভাসিয়া নিঃশেষে বাহির হইয়া গেলো।"[১১]

স্বামীকে পুনরায় এই শয্যায় দেখবে এই প্রত্যাশাই ছেড়ে দিয়েছিল ক্ষণপ্রভা। অথচ এমনও একদিন ছিল যেদিন এই শয্যায় তারা এক আত্মার বন্ধনে বেঁধেছিল। সুখের ঢেউ উঠেছিল সেদিন। কিন্তু আজ সে শূন্য। তাই এই মুহূর্তে স্বামীকে দেখে সর্বাঙ্গ শরীর যেন তার ঘৃণায় ভরে গেছে। চোখের সামনে স্বামী নয় একটা শরীর দাঁড়িয়ে আছে। একটা কেবল মাংস পিন্ড। যার মধ্যে কোনো প্রাণ নেই। সেই চরিত্র যেমন কদর্য তেমনই লোলপ। এই সম্পর্কের পতন এতটাই তীব্র ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে ক্ষণপ্রভা তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সে উন্মাদ, কিন্তু মাতৃত্বটা ঠিক বজায় রেখেছে।

আলোচ্য প্রবন্ধের আলোচনার শেষে আমরা বলতে পারি যে এই গল্পে জগদীশ গুপ্ত প্রধান নারী চরিত্রের অদৃষ্ট জীবন যন্ত্রণারই আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। সামাজিক অন্যায়-অত্যাচারে চেয়েও চরিত্রের অদৃষ্ট রচনাই দুঃময়তার কারণ বলে তাঁর গল্পে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে জগদীশ গুপ্তের রচনায় নৈপুণ্যতা প্রকাশ পায়। তাঁর রচনাশৈলীর নৈপুণ্যতা সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন—

> "মানুষের জীবনের অতিশয় দয়াহীন ও দুর্জ্ঞেয় দৈব-নির্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে; মনে হয় জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার একপ্রান্তে একটা অন্ধকারের কোণ আছে সেখানে একটা নামহীন আকারহীন হিংস্রতা সর্বক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার।"[১২]

উক্ত মন্তব্য জগদীশ গুপ্তের 'চন্দ্র সূর্য যতোদিন' গল্পটির রচনাশৈলীকে চিরন্তন করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোট গল্পের একশ কুড়ি বছর। ১৮৯১-২০১০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ১৯৮২, পৃ. ৪২৩।
২. দেবী, আশাপূর্ণা। আর এক আশাপূর্ণা। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লা:, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ: বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ১৭।
৩. রায়চৌধুরী, সুবীর সম্পাদনা। জগদীশ গুপ্তর গল্প। ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, প্রথম মুদ্রণ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায়, পৃ. ৩৬।
৪. তদেব, পৃ. ৩৭-৩৮।
৫. তদেব, পৃ. ৪৭।
৬. তদেব, পৃ. ৪৭।

৭. তদেব, পৃ. ৪৭।
৮. তদেব, পৃ. ৪৮।
৯. তদেব, পৃ. ৪৯।
১০. তদেব, পৃ. ৪৯।
১১. তদেব, পৃ. ৪৯।
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। (খ্রিস্টীয় দশম- বিংশ শতাব্দী) প্রকাশক: মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ- ১৯৬৬, অতিরিক্ত সংযোজন, পৃ. ৩।